গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জ্জী এম,এল,এ

সোস্যালিষ্ট ইউনিটী সেন্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা] শনিবার ৭ই মার্চ, ১৯৫৩, ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৫৯ [এক আনা

বিশ্ব সর্বহারার প্রিয়তম নেতা সাম্যবাদী অগ্র-অভিযানের পথিকৃৎ

মহান ষ্ট্যালিনের জীবনাবসান

(২১ ডিসেম্বর ঃ ১৮৭৯—৫ মার্চ ঃ ১৯৫৩)

"ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার সমগ্র বিশ্বের শোষিত মানবতার মহান নেতা ও শিক্ষক কমরেড ষ্ট্যালিনের মৃত্যুতে গভীর শোকের সহিত তাহার লাল পতাকাকে অবনত করিতেছে। তাঁহার জীবন সর্ববিধ অবিচারের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন ক্ষমাহীন সংগ্রামের জীবন, সর্বহারা শ্রেণীর দর্শন, বঞ্চতের মুক্তি-সংগ্রামের কর্ম-নির্দ্দেশ। তাঁহার শিক্ষাকে এই দেশে বাস্তবে রূপায়িত করিবার সংকল্প আমরা নূতন করিয়া লইতেছি।

"কমরেড লেনিনের সহকর্মী ও লেনিন-ষ্টালিন পার্টি—বলশেভিক পার্টির সংগঠক কমরেড ষ্টালিন দুনিয়ার মেহনতী মানুষকে দেখাইয়াছেন শান্তি প্রগতি সমৃদ্ধির পথ—সমাজতন্ত্র সাম্যবাদের পথ। এই সভা মানবজাতির শ্রেষ্ঠ নেতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করিতেছে, এবং সৌভ্রাত্র মূলক আনুগত্য ঘোষণা করিতেছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের প্রতিনিধিত্বে আন্তর্জাতিক শ্রমিক নেতৃত্বে।

আমাদের প্রিয়তম নেতার সর্বশেষ বাণী হইতেছে শ্রমিক শ্রেণীর সংহতি গঠন, বিশ্ব-শান্তি রক্ষা ও সর্ব প্রকার শোষণ মুক্ত নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠাকরার আহ্বান। ভারতের শ্রমিক-শ্রেণীর উপর ন্যস্ত, মহান নেতা প্রদত্ত, পরিপূর্ণ দায়িত্ব পালনের অংগীকার আমরা ঘোষণা করিতেছি।"

[৬ই মার্চ্চ সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কর্মীদের অনুষ্ঠিত শোকসভায় গৃহীত প্রস্তাব]

'কল্যাণ রাষ্ট্রের' দেউলিয়া বাজেট

অযোগ্যতা, খামখেয়ালীজ নবিরোধী নীতির প্রতিচ্ছবি

[পশ্চিম বংগ বিধান সভায় বর্তমান বাজেটের বিভিন্ন দিককে বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করে কমরেড সুবোধ ব্যানার্জি যে তথ্যবহুল ও সারগর্ভ বক্তৃতা দেন, তার বিষয়বস্তুকে সংক্ষিপ্ত করে প্রবন্ধাকারে এখানে দেওয়া হ'ল—সঃ গঃ]

পশ্চিম বংগের অর্থ তথা মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায় বর্তমান বছরের (১৯৫৩-৫৪) বাজেট পেশ করে বিশেষ গৌরব ও কৃতিত্বের দাবী করেছেন। কিন্তু জনস্বার্থের খাতিরে বিচার করতে গেলে এক নজরেই বোঝা যায় এ বাজেট কতটা নৈরাশ্যজনক ও গতানুগতিক ছাঁচে ঢালা। অর্থনৈতিক শাসন ব্যবস্থা ও জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য পালনের, কিংবা প্রদেশের শিল্পোন্নয়ন কৃষির সুব্যবস্থা, জনশিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যুবসমাজের শোচনীয় বেকারী, যে কোন সমস্যার কথাই ধরা যাক, কোন দিক দিয়েই এতে আশ্বাসের ইংগিত নেই। বাজেটের প্রতিটি খাতের হিসাব নিকাশ থেকেই তার প্রমাণ মেলে।

শিল্পোন্নয়নের সর্বক্ষেত্রে নির্বিকার অবহেলা

যে কোন শিশুকেও বোধ হয় আজ বুঝিয়ে দিতে হয় না যে, দ্রুত শিল্পায়ন ছাড়া দেশের বর্তমান দারিদ্র্য ও বেকারীকে রোধ করা যাবে না। কিন্তু আমাদের 'দূরদর্শী' অর্থমন্ত্রী শিল্পের জন্য বরাদ্দ করেছেন মোট খরচের ·৭% ভাগ! তারপরই আসে কৃষি। বড় বড় অর্থনীতিবিদদের মতে এটাই হ'ল এদেশের বৃহত্তম শিল্প, যা দেশবাসীর প্রায় ৫৫% কে ভরণ-পোষণ জুগিয়ে থাকে। আর পশ্চিম বংগের সবচেয়ে গুরুতর সমস্যাও হচ্ছে কৃষি সমস্যাই। এ হেন কৃষি সমস্যার কপালে জুটেছে মোট খরচের ৫·৯%। ১৯৫১-৫২ সালের বাজেটে ধার্য্য কৃষি বাবদ ৬·৭% থেকে ধাপে ধাপে কমতে কমতে আজ তা এসে দাঁড়িয়েছে ৫·৯%য়ে। শিক্ষার অবস্থাও তথৈবচ। ডাঃ রায় খুব জাঁক করে বাংলার যুবসমাজকে উপদেশ দিয়েছেন শারীরিক পারিশ্রমের কাজ করতে ও বিভিন্ন ধরণের কর্মক্ষেত্রে প্রতিভা নিয়োজিত করতে। তাঁর 'সুখী পরিবারে'র কল্যাণে উপার্জনের ক্ষেত্রে প্রতিভা ও যোগ্যতার স্থান আজ কোথায়, তা আর কাউকে বলে দিতে হয় না। তাদের কাছে আজ তার অস্পৃশ্য কাজ বলে কিছু নেই; নইলে গ্র্যাজুয়েট যুবক রাস্তায় জুতো পালিশ করতে নেমেছে, পান বিড়ির দোকান খুলেছে, এ রকম নিদর্শন মিলত না।

বিভিন্ন খাতে রাজস্ব-লব্ধ আয়ের বণ্টন কি ভাবে করা হচ্ছে তা লক্ষ্য করে দেখলে আমাদের এই ঢাক-ঢোল পেটান কল্যাণ রাষ্ট্রের ধরণ-ধারণ বেশ টের পাওয়া যায়। ব্যয়ের শতকরা ২৯ ভাগ ধার্য্য হয়েছে সাধারণ শাসন, জেল, পুলিশ ইত্যাদিতে। শিক্ষা, চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্য মোট বরাদ্দ হয়েছে শতকরা ২৭ ভাগ। এই তারতম্য যে কর্মক্ষেত্রে আরো বেড়ে যাবে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে। কিন্তু জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি লাভ করলেই যে জনসাধারণের কল্যাণ বৃদ্ধি হয় না তার প্রমাণ এই কল্যাণ রাষ্ট্র ভালভাবেই দিচ্ছে। এই দিক থেকে বর্তমান বাজেটের দৃষ্টিভংগী বৃটিশ আমলের চূড়ান্ত কুখ্যাত শাসকদের বাজেট বা মুসলিম লীগ রাজত্বের বাজেট থেকে পৃথক নয়। মিষ্টি বুলির আড়ালে হ'লেও আমলাতন্ত্রের রাজত্ব অব্যাহত গতিতে চলেছে।

অযোগ্যতার রাজত্ব

কিন্তু শুধু তাই নয়; বাজেটা তৈরী করাও হ'য়েছে নেহাৎ-ই অযোগ্যভাবে। সরকারের যে সমস্ত বিভাগ থেকে রাজ-

(৪র্থ পাতায় দেখুন)

সিংভূম জেলা কিষাণ সম্মেলন

অদিবাসী কৃষকদের মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার

গত ৭ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারী সংযুক্ত কিষাণ সভা ও সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের যুক্ত উদ্যোগে সিংভূম জিলা কিষাণ কর্মী সম্মেলন মানভূমের বিশিষ্ট কিষাণ নেতা কমরেড সাধু চরণ ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে বিশেষ উদ্দীপনার সাথে ঘাটশীলায় অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে সিংভূমের বিভিন্ন মৌজা ও তরফ হইতে একশত আটচল্লিশ জন কিষাণ কর্মী প্রতিনিধিত্ব করেন।

কর্মী সম্মেলনের প্রারম্ভে জিলার সাঁওতাল যুবকদের প্রোগ্রেসিভ কালচারাল এসোসিয়েশন ও পঃ বঃ পি, সি,এ'র সহ-সম্পাদিকা কমরেড নিহারীকা মজুমদার গণ-সঙ্গীত করেন।

সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ সিংভূমের কিষাণদের কংগ্রেসী ধনিক-জমিদার শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষণের তীব্র নিন্দা করিয়া বিহার সরকারের তথা কথিত জমিদারী প্রথা বিলোপের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া এবং বিশেষভাবে আদিবাসীদের জন্মগত বনজ সম্পদের অধিকারে সরকারী হস্তক্ষেপের কু-ফল বর্ণনা করিয়া প্রতিকারের জন্য, কিষাণ আন্দোলনকে একটি মাত্র সংগঠনে তথা সংযুক্ত কিষাণ সভায়; একটি মাত্র পতাকাতলে লাল ঝাণ্ডার নীচে লৌহদৃঢ় সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা লইতে উদাত্ত আহ্বান জানান।

সম্মেলনের প্রধান অতিথি সারা ভারত সংযুক্ত কিষাণ সভার নেতা কমরেড নীহার মুখার্জী সিংভূমের কিষাণদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের সুদীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বর্তমান বৎসরের খাদ্য সংকট তথা খাদ্য শস্য রোগে ও পোকায় নষ্ট হওয়া সম্পর্কে সরকারী ঔদাসীন্যে কিষাণদের উপর দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব সম্পর্কে এখনই সজাগ হইয়া সংগ্রামের প্রস্তুতি গড়িবার জন্য প্রতিটি গ্রামে সংযুক্ত কিষাণ সভার কেন্দ্র স্থাপন করিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে বলেন।

কর্মী সম্মেলনে বিহারের কিষাণ নেতা কমরেড হীরেণ সরকার, সিংভূমের কিষাণ নেতা কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী দুঃখীরাম মাডঙী, ঈশ্বর সিং, দুঃখীরাম মাঝী প্রমুখ বক্তাগণ বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথার বিলোপ, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ, জঙ্গল আইন রোধ প্রভৃতি দাবীর প্রস্তাব বিশ্লেষণ করিয়া বক্তৃতা করেন এবং উপরোক্ত দাবীসমূহ প্রতিনিধি সম্মেলনে সিংভুম জিলা আন্দোলনের প্রধান দাবী হিসাবে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সাংগঠনিক এই প্রস্তাব অবিলম্বে সিংভূমের সমস্ত মৌজা ও তরফে সংযুক্ত কিষাণ সভার কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

গালুডি'তে বিরাট কিষাণ সমাবেশ

৯ই ফেব্রুয়ারী সিংভূম জিলা কিষাণ কর্মী সম্মেলনের উপলক্ষে গালুডি'তে এক বিরাট কিষাণ সমাবেশ কমরেড হীরেণ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

(শেষ পাতায় দেখুন)

উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা ও বাঁচার তাগিদে শিক্ষকদের অভিযান

অ্যাসেমব্লী-মুখে বিক্ষোভ মিছিল

শিক্ষা খাতে অধিক ব্যয় বরাদ্দের দাবী আজ নূতন নহে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও সর্ব্বাঙ্গীন করার প্রয়োজনীয়তা এতদিন পর্য্যন্ত অবহেলিত হইয়াই আসিয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় এবৎসরের বজেট অধিবেশনের পূর্ব্বে এই দাবী ক্রমশঃই ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের শিক্ষাজগত এক মহাসঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। শিক্ষার প্রতি সরকারী ঔদাসীন্য এক চরম আকার ধারণ করিয়াছে। একদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয়ভার, অন্যদিকে শিক্ষার বাহক অর্থাৎ শিক্ষক সমাজ সাধারণ এবং নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবার ফলে এক ভীষণ সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্ত্তন, সার্ব্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন, শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণের কথা ছাড়িয়া দিলেও বর্তমান সরকারের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে, এযাবৎ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী কমিশন ইতিমধ্যেই শিক্ষাখাতে অধিক ব্যয় বরাদ্দের রায় দিয়াছেন। বিভিন্ন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদও ইহার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়াছেন।

এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই শিক্ষক এবং ছাত্র সমাজ আন্দোলনের পথে পা বাড়ান। গত ৭ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারী 'প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনে এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ছাত্রদের পক্ষে "শিক্ষা সঙ্কট প্রতিরোধ কমিটি"র নেতৃত্বেও আন্দোলন দানা বাঁধিতে থাকে এবং গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী ডাঃ জে, কে ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে এক "শিক্ষা দাবী সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম বাংলার শিক্ষা সমাজের সবচেয়ে অভূতপূর্ব্ব ও যুগান্তকারী ঘটনা হইতেছে ২৫শে ফেব্রুয়ারীর শিক্ষক মিছিল। আবেদন নিবেদনের ক্ষেত্র এবং কার্য্যকারীতা যে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং গণআন্দোলনের পথ ছাড়া যে অন্য কোন পথ নাই এই সত্যটি বাংলার শিক্ষক সমাজ গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের সম্মান বাড়িয়াছে বই কমে নাই। এই আন্দোলন তাঁহাদের ৩৫৲ টাকা মহার্ঘ্য ভাতা বৃদ্ধির দাবীতেই সীমাবদ্ধ নহে, সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের দাবীতে অনুপ্রাণিত। একদিকে ছাত্র সমাজ যাঁহারা শিক্ষা গ্রহণ করেন অন্যদিকে শিক্ষার বাহক হিসাবে শিক্ষক সমাজ- আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই দুই শক্তির মিলন আজ সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গবাসীকেও এই ঘোর দুর্দিনেও আশায় আলো দেখাইয়াছে। এই দাবী পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত আন্দোলন ধাপে ধাপে চলিতে থাকিবে এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হইয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গ নিরাপত্তা আইন ও প্রতিরোধ আন্দোলন

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভায় "পশ্চিম বঙ্গ জননিরাপত্তা বিল" পাস হয়ে গেল। পশ্চিম বাংলার সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই কথা কথিত জননিরাপত্তাবিলকে রোখার জন্য আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। কিন্তু তা সত্বেও শুধুমাত্র ভোটের জোরে কংগ্রেসী সরকার এই বিলকে আইনে পরিণত করলো। বিধান সভায় কংগ্রেস-বিরোধীদলগুলি ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই বিলের তীব্র সমালোচনা করে এই বিলের আসলরূপকে খুলে দিয়েছে কিন্তু বিধান সভার ভিতরে এবং বাহিরের জনসাধারণের অভিমত উপেক্ষাকরে কংগ্রেসী সরকার এই আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি করে একে নতুন করে জনসাধারনের ঘাড়ে চাপিয়েদিয়েছে দেশের গড়ে ওঠা গণআন্দোলনকে টুঁটি চেপে মারবার জন্য, যাতে এই পুঁজিবাদী সরকারের শোষন ও শাসন অক্ষুন্ন রেখে গদীর মেয়াদ বৃদ্ধি করা যায়। 'বিনা বিচারে আটক' বা এই ধরণের আইন রাখার প্রয়োজন বর্ত্তমানে আমাদের দেশে নাই, তবুও এই ধরণের আইন সরকার কেন হাতে নিতে চাইছে তার কারণ দেশের বেকার সমস্যার বিরুদ্ধে, কৃষকদের জমীদারী প্রথার বিরুদ্ধে এবং ন্যায্য মজুরীর দাবীতে যে তীব্র গণআন্দোলন দানা বেধে উঠেছে, সেই গণআন্দোলন যাতে সরকারের বিরুদ্ধে ফেটে না পড়তে পারে সেই জন্য এই বিনা বিচারে আটক রাখার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সরকারী অব্যবস্থার বিরুদ্ধে যাতে আইন সম্মত ভাবেও প্রতিবাদ করা না যায় তারই ব্যবস্থা হিসাবে এই বে-আইনী আইন করা হয়েছে। এই আইনের ফলে বাংলা দেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, বেকারী বিরোধী ও খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা প্রভৃতি আন্দোলনের কর্ম্মীদের বিনা বিচারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটক করে রাখা যাবে—সরকার যখনই মনে করবে আইন সম্মত ভাবে কাউকে আটক করা যাচ্ছে না তখনি এই তথাকথিত "জননিরাপত্তা আইন" কাজে লাগবে। তাই পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ এই জবরদস্তি অগণতান্ত্রিক আইনকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে পারে নি। জনসাধারণের আন্তরিক বিরোধীতা সত্বেও বিধান সভায় ভোটের জোরে কংগ্রেসী সরকার আইন পাশ করে নিয়েছে।

কিন্তু এই আইনকে রোধ করবার জন্য যে সম্মিলিত নিরাপত্তা বিল প্রতিরোধ কমিটি গঠন কালা কানুন প্রতিরোধ সংকল্প পঃ বঙ্গে প্রত্যেকটি বামপন্থী দল ঘোষণা করেছিল তা কেন প্রতিবাদের গণ্ডী ছাড়িয়ে প্রতিরোধের স্তরে উন্নীত হল না—এ প্রশ্ন গণতান্ত্রিক ভাবাপন্ন প্রতিটি মানুষের মনে আজ জেগে উঠেছে। প্রশ্ন হচ্ছে কংগ্রেসে সরকারের জনবিরোধী কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে পূর্বে যে কয়টি প্রতিরোধ আন্দোলন হয়েছে—আজকে কি জনসাধারণ তার চাইতে পিছিয়ে পড়েছে? আজকে বিগত রেল পুনর্বিন্যাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ" দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ" এর সময় হতে জনগনের সংগ্রামী মনোভাব কোনদিক থেকে কমে গিয়েছে?—উত্তরে জনসাধারণ বলবেন না কখনোই নয় কিন্তু। কোন কোন রাজনৈতিক মহল হইতে বলা হচ্ছে এখন প্রতিরোধ নয়, শুধুমাত্র প্রতিবাদ করাই নাকি তাহার দলীয় নীতি। তাই তারা প্রতিরোধের জন্য কালাকানুনের বিরুদ্ধে নিজেরাও তৈরী নন এবং জনসাধারণকেও আহ্বান করতে চান না। কোন দল তৈরী কিনা তার চাইতেও আন্দোলনের বড় প্রশ্ন হচ্ছে—আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তায় প্রতিরোধ করতে হবে, বা অন্যপন্থায় কৃতকার্য্য হওয়া যাবে। এবং জনসাধারণের মধ্যে সংগ্রামের চেতনা ও মনোভাব কতটা তৈরী আছে। এদিক থেকে বিচার করলে একথা নিসন্দেহ বলা যায় যে শুধু প্রতিবাদে সরকারের নীতি পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নয়, তাই প্রতিরোধের কার্য্যকারীতা সবাই মেনে নিতে বাধ্য হন। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে জনগনের সংগ্রামী চেতনা ও মনোভাব নিয়ে। এ প্রসঙ্গে একথা বলাই যথেষ্ট যে পূর্বের প্রতিরোধ আন্দোলন গুলিতে জনসাধারণের অংশগ্রহণ যদি কেউ চোখ বুজে অস্বীকার না করেন এবং প্রথম দিনের নিরাপত্তা বিল প্রতিরোধের আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেভাবে জনগণ এগিয়ে এসেছিলেন আন্দোলনের নেতৃত্বও যদি তদনুযায়ী দৃঢ়সংকল্প ও সুস্পষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করে তাকে পরিচালিত করে নিয়ে যেতে পারতেন তবে সংগবদ্ধ জনশক্তির আঘাতে এ জঘন্য কালা কানুনকে প্রতিহত করা নিশ্চয়ই সম্ভব হত।

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সঙ্কট ও একচেটিয়া পুজিবাদের প্রসার

ব্যাঙ্ক কর্মচারী সম্মেলনে সুবোধ ব্যানার্জির বক্তৃতা

গত ১৪ই, ১৫ই ও ১৬ই ফেব্রুয়ারী ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের এক সম্মেলন ইউনি-ভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ ধীরেন সেন, সম্মেলন উদ্বোধন করেন শ্রীযুক্ত সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীযুক্ত নৃণালকান্তি বসু।

সম্মেলন উদ্বোধন প্রসঙ্গে শ্রীসুবোধ বন্দোপাধ্যায় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া দেখান যে আজ দুনিয়ার অর্থনীতি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে; **পাশাপাশি দুইটি** বাজার আজ অবস্থান করিতেছে। এক দিকে দ্রুত অগ্রগতির পথে সোভিয়েত, চীন ও নয়াগণতান্ত্রিক দেশগুলির অধীনস্থ সম্পদ অন্যদিকে ক্ষয়িষ্ণু ও সঙ্কুচিত ধনতান্ত্রিক বাজার। এই শেষোক্ত দেশগুলির অর্থ-নীতি আজ এক বিরাট সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। বিভিন্ন দিক হইতে বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী অর্থনীতি আজ দ্রুত ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছে।

তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন অগ্রগামী পুঁজিবাদী শক্তি সমূহের নিজ নিজ দেশের বাজার ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। ইহার কারণ হইতেছে যে জনসাধারণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করভারে জরাজীর্ণ। ফলে তাহাদের ক্রয় ক্ষমতার অবনতি ঘটিতেছে। ১৯৫২ সালে আমেরিকাতে মোট জাতীয় আয়ের ৩০%, গ্রেট বৃটেনে ৫০%, এবং ফ্রান্সে ৩৯% ভাগ জনসাধারণের নিকট কর হিসাবে আদায় করা হইয়াছে। তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—দেশীয় বাজার সঙ্কোচন।

ইহার ফলে বিদেশী বাজার অন্বেষণ প্রচেষ্টা বাড়িয়া যায়। এই সঙ্কটের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে স্বল্পমূল্যে বহির্বাণিজ্য চালাইবার নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। আমেরিকার কোন কোন রপ্তানী মালের মূল্য দেশীয় বাজার অপেক্ষা শতকরা ২৫-৩০ ভাগ কম ধার্য্য করা হইয়াছে (dumping and subsidies).

কিন্তু তবুও এ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব হয় নাই। আমেরিকার ১৯৫২ সালের প্রথমার্দ্ধে ১৯৫১ সালের দ্বিতীয়ার্দ্ধ অপেক্ষা মূল্যের দিক হইতে ২½ বিলিয়ণ ডলার এবং আয়তনের দিক হইতে ৩% ভাগ বাণিজ্য কমিয়া গিয়াছে। গত যুদ্ধের পর পুঁজিবাদী দেশগুলির এই সর্ব প্রথম মূল্য ও আয়তন দুই দিক হইতেই বহির্বাণিজ্য বন্ধ হইল।

এখানে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, যুদ্ধাস্ত্রের রপ্তানি কিন্তু ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৫১ সালের প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা ১৯৫২ সালের প্রথমার্দ্ধে ট্যাঙ্ক, বন্দুক, প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্রের রপ্তানী আমেরিকার বাড়িয়াছে ৩০% ভাগ এবং বৃটিশের বাড়িয়াছে ৪২% ভাগ।

ভারতবর্ষের অবস্থা

পুঁজিবাদী দুনিয়াজোড়া এই অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতের অবস্থাকে বিচার করিতে হইবে। বৃটেন, আমেরিকা প্রভৃতি অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্কট ভারতের অর্থনীতিকে এক বিরাট ধাক্কা দিয়াছে। ইহার ফলে বাজার সঙ্কোচন, মন্দা, চা-বাগান, কয়ল খনি এবং পাট শিল্প প্রভৃতিতে ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে। ইতিমধ্যেই ১২৪টি চা বাগান বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কাছাড়…২৬টি চা বাগান বন্ধ হওয়ায় ২২৫৫৬ জন শ্রমিক বেকার হইয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গের জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীগুলির অবস্থা

	(কত কোম্পানী বন্ধ হইয়াছে)	আদায়ীকৃত মূলধন লক্ষের অঙ্কে
১৯৪৮	৯০	১৩৩
১৯৪৯	১৭৯	২৯৪
১৯৫০	১০২	৫৬৩
১৯৪১	১৬২	১৭১
১৯৫২	২২	৭৪

(প্রথম তিন মাসে)

একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রভাব বৃদ্ধি

বিভিন্ন সময়ে অনুমোদিত ব্যাঙ্কের সংখ্যা।

১৯৩৫	২০৭৮
১৯৪৮	১৭১১
১৯৪৯	১৫৮৭
১৯৫০	১৫৭৪

এখানে দেখা যাইতেছে যে অনুমোদিত ব্যাঙ্কের (Non-Seheduled Bank) সংখ্যা ক্রমশয়ই কমিয়া যাইতেছে অর্থাৎ ছোট ছোট ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে। ইহা ছাড়া লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে অনুমোদিত ব্যাঙ্ক সমূহের মধ্যে ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমূহ বিদেশী ব্যাঙ্ক অপেক্ষা অনেকাংশে শক্তি-শালী। **১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৫০ সালের হিসাব** দেখিলে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায়।

ভারতীয় অনুমোদিত ব্যাঙ্ক:—

১৯৩৮ সালে deposit (গচ্ছিত টাকা) ১৭৩২৭ লক্ষ

১৯৫০ সাল—৬৯৮৪১ লক্ষ

মোট বৃদ্ধি—৫২৫১২ লক্ষ

বিদেশী অনুমোদিত ব্যাঙ্ক

১৯৩৮ সালে deposit (গচ্ছিত টাকা) —৭০০৭ লক্ষ

১৯৫০ সাল—১৯৫৭৬ লক্ষ

মোট বৃদ্ধি—১০,৫৬৯ লক্ষ

ক্যাশ—

ভারতীয় অনুমোদিত ব্যাঙ্ক:—

১৯৩৮ সাল · ২২৪৪ লক্ষ টাকা

১৯৫০ সাল - ১০৩৫৫ লক্ষ টাকা

মোট বৃদ্ধি—৮১১১ লক্ষ টাকা

বিদেশী অনুমোদিত ব্যাঙ্ক

১৯৩৮ সাল—৫২৭ লক্ষ টাকা

১৯৫০ সাল—১৯১৫ লক্ষ টাকা

মোট বৃদ্ধি—১৩৮৮ লক্ষ টাকা

ধার ও আগাম

(Lone and Advance)

ভারতীয় অনুমোদিত ব্যাঙ্ক:—

১৯৩৮ সাল—৮৫৯৯ লক্ষ টাকা

১৯৫০ সাল—৩১৬০০ লক্ষ টাকা

মোট বৃদ্ধি—২৩,০০১ লক্ষ টাকা

বিদেশী অনুমোদিত ব্যাঙ্ক

১৯৩৮ সাল—৩৩৮৪ লক্ষ টাকা

১৯৫০ সাল—১৩৫৬৫ লক্ষ টাকা

মোট বৃদ্ধি—১০,১৮১ লক্ষ টাকা

সুতরাং বিদেশী ব্যাঙ্ক সমূহের পাশা-পাশি দেশীয় ব্যাঙ্কের অবস্থা বোঝা গেল। শুধু তাহাই নহে ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রভাব আর একটি দৃষ্টান্ত হইতেও উপলব্ধি করা যায়। কেননা ৫টি কি ৬টি ব্যাঙ্কের আয় এবং সম্পদ সমগ্র ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমূহের আয়ের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে ধীরে ধীরে সমস্ত টাকা অল্প সংখ্যক লোকের হাতে জমা হইতেছে। ইহা ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের নগ্নরূপ। এরমূল কাঠামোকে ধ্বংস করিতে না পারিলে এই সঙ্কট হইতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। এই শিক্ষাই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জিলা এস, ইউ, সি, কর্মী সম্মেলন

গত ১৪ ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জিলা কমিটির উদ্যোগে পার্টির কিষাণ, ক্ষেত মজুর, বাস্তুহারা, মজুর ও ছাত্র কর্মীদের এক প্রতিনিধি সম্মেলন জয়নগর-মজিলপুরে এস, ইউ, সি' আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড নীহার মুখার্জীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে জিলার বিভিন্ন ইউনিয়ন হইতে তিনশত বাইশ জন কর্মী প্রতিনিধিত্ব করেন।

কর্মী সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া এস, ইউ, সি, আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদী পার্টি হিসাবে এস, ইউ, সি'র দায়িত্ব ব্যাখ্যা করিয়া মেহনতী জনগণের প্রতিটি স্তরে পার্টি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কর্মীদের নির্দ্দেশ দেন। কমরেড ঘোষ, মেহনতী জনগনের পার্টি, বিশেষত সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর দলের কর্মীদের জনগণের ছোট বড় প্রতিটি সমস্যা নিজেদের সমস্যা হিসাবে গ্রহণ ও সমাধানের মধ্য দিয়াই জনসাধারণের সত্যিকারের পার্টিতে পর্য্যবসিত হওয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করিতে কর্মীদের আহ্বান করেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জিলা এস, ইউ, সি'র সম্পাদক কমরেড অপরে চাটার্জী বিগত বৎসরের জিলার কার্য্য বিবরনী পেশ করিয়া দেখান কী ভাবে ক্ষুদ্র অবস্থা হইতে সং-গ্রামের ও সত্যিকারের বিপ্লবী আদর্শের ভিত্তিতে পার্টির কেন্দ্র ও সভ্য সংখ্যা চারি গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং খণ্ড খণ্ড আন্দো-লনের পুরোভাগে থাকিয়া সরকার ও ধনিক জমিদার মহাজনদের পরাস্ত করিয়া জন-সাধারণের দাবী প্রতিষ্ঠায় পার্টি অগ্রসর হইয়াছে।

সম্মেলনের সভাপতি মুখার্জী পার্টি কর্মীদের জিলার কিষাণ, ক্ষেতমজুর প্রভৃতি গণ আন্দোলনের কৃত-কার্য্যতার জন্য অভিনন্দন জানাইয়া, কর্মী কি পদ্ধতিতে কাজ করিলে গণ আন্দোলনকে আগাইয়া নিয়া আরও শক্তিশালী এবং নিজেদের যোগ্য হইতে যোগ্যতর কর্মীতে উন্নীত করিতে পারেন তাহা বর্ণনা করিয়া কর্মীদের প্রতিনিয়ত মার্কসবাদের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজেদের কর্মনির্দ্ধারণ ও জীবন দর্শণ অনুধাবনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে আহ্বান জানান।

কর্মী সম্মেলনে বিনা খেসারতে জমিদারী, লাটদারী ও অনুরূপ ভূমি ব্যবস্থা সমূহের উচ্ছেদ; লেভীপ্রথার প্রত্যাহার; কৃষিঋণ মকুব; বাজারের মান অনুযায়ী মজুরী নির্দ্ধারণ; বাস্তুহারা পুনর্বাসনের জন্য সক্রিয় আন্দোলন; খাদ্য ঘাটতি পূরণ; কালা কানুন প্রত্যাহার; বিশ্বশান্তির জন্য ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্ত রোধ প্রভৃতির দাবী ও জিলার আগামী ইউনিয়ন বোর্ড নির্বাচনে পার্টির নীতি বিশ্লেষণ করিয়া কমরেড সুধীর ব্যানার্জী, নীরেন্দু ব্যানার্জী, বীরেন ব্যানার্জী, পাঁচুগোপাল কাঁসারী, অমল রায়, ইয়াকুব পৈলান, মোবারক আলী মোল্লা, রবীন মণ্ডল, রেনুপদ হালদার, আবদুল হান্নান গাজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বক্তৃতা করেন।

কর্মী সম্মেলনে উপরোক্ত প্রস্তাব সমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং উক্ত প্রস্তাব সমূহের ভিত্তিতে জিলার সর্বত্র পার্টির আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করিয়া আন্দোলন পরিচালনায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সম্মেলনের শেষে ঘোষনা করা হয় যে আগামী ১৮ই ও ১৯শে এপ্রিল যুক্ত কিষাণ সভার প্রাদেশিক সম্মেলন জয়নগর মজিল-পুরে স্থির হওয়ায় প্রাদেশিক যুক্ত কিষাণ সভাকে কর্মী সম্মেলন অভিনন্দন জানাই-তেছে। পঃ বঃ প্রাদেশিক সম্মেলন সফল জন্য কর্মী সম্মেলন হইতে কার্য্যকরী বলম্বন করা হয়।

'কল্যাণ রাষ্ট্রে'র দেউলিয়া বাজেট

(১ম পাতার শেষাংশ)

স্বাগম হয়ে থাকে, সেই সব বিভাগের রাজস্ব-ব্যয়োবৃদ্ধি (incidence of revenue expenditure) লক্ষ্য করলেও সর্বত্রই অযোগ্যতার ছাপ ফুটে ওঠে। পূর্বেকার বাজেটের তুলনায় এবারকার বিভাগীয় আয় ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায় যে, ভূমি রাজস্ব, আবগারী, রেজিষ্ট্রেশন, বন বিভাগ প্রভৃতিতে আয়ের তুলনায় ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। এগুলো প্রদেশের শাসন ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত পরিচালকদের অযোগ্যতারই সাক্ষ্য দেয়। 'র‍্যাশনালাইজেশন' কথার কথাটা শোনা যায় এবং প্রয়োগও হয়ে থাকে কেরাণী চাপরাশীদের প্রতি। কিন্তু সত্যি যদি প্রদেশের মংগলের জন্য র‍্যাশনালাইজেশনকে কার্যকরী করতে হয় তবে এই মাথাভারী শীর্ষদেশের মন্ত্রী, উপমন্ত্রী. পার্লা: সেক্রেটারী ও সেক্রেটারীর বাহিনীকে দিয়েই সুরু করা প্রয়োজন।

সরকারের পেটোয়া 'জাতীয়তাবাদী' কাগজপত্রে বলা হ'য়েছে, ঘাটতি বাজেট হলেও একে সুচিন্তিত বলতে হবে। এখন পর্যন্ত অবশ্য কোন খানেই সুচিন্তা বা সুপরিকল্পনার নমুনা আমরা দেখতে পাইনি। 'সরকারী বাণিজ্য পরিকল্পনা, (State Trading Scheme)র নামে সরকার যে ভাবে সাধারণের অর্থকে জলে ফেলছে তাতে সরকারের বেপরোয়া মনোভাবই প্রকাশ পায়। হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রতিষ্ঠানে ১৯৫১-৫২ সনে ৬ লক্ষ ৫৭ হাজার, ১৯৫২-৫৩ য়ে ৬ লক্ষ ৪৪ হাজার, ১৯৫৩-৫৪ য়ে ৭ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ক্ষতি হয়েছে। 'খাদ্য ক্রয় পরিকল্পনায়' যথাক্রমে মোটামুটি ২ কোটি ২ লক্ষ; ৩ কোটি ২৪ লক্ষ ও ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে। আর ষ্টেট ট্রান্সপোর্টের খবর সর্বজনবিদিত; তবু সংখ্যাগুলো জনসাধারনের জানা দরকার—ক্ষতির পরিমাণ এখানে হয়েছে ১৪ লক্ষ ৩২ হাজার; ২০ লক্ষ ৩৭ হাজার ও ১১ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। এই হ'ল সুপরিকল্পনার বহর! ডাঃ রায় তাঁর ব্যবসায়ী প্রতিভা নিয়ে গর্ব বোধ করেন। তাঁর ব্যবসায়ী প্রতিভা নিশ্চয়ই উচ্চাংগের স্বীকার করতে হবে, যদি অবশ্য নির্বিবাদে তার ঝুঁকি বহন করে থাকে গভর্ণমেন্ট, ক্ষতির বোঝা পড়ে গিয়ে জনতার প্রপীড়িত স্কন্ধে এবং লাভের অংক যায় তাঁর থলেতে। কিন্তু এত করেও জনতা সইতে রাজী ছিল যদি তার দুর্দশার কিছু অন্ততঃ সুরাহা হ'ত।

পুঁজিবাদী সংকটের উঁকিঝুঁকি

অর্থমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন, প্রদেশের উৎপাদন বেড়েছে ও কোন রকম সংকট অস্তিত্ব নেই। কথাটা মিথ্যে, কারণ অর্থনীতির সাধারণ-জ্ঞানবিশিষ্ট যে কোন লোকই জানে সামগ্রিকভাবে আমাদের আর্থিক অবস্থার অবনতি হ'চ্ছে। অপেক্ষাকৃত ছোট খাট শিল্প ও ব্যবসা ক্রমাগতই একটার পর একটা উঠে যেতে বাধ্য হ'চ্ছে; মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোও লোপ পাচ্ছে। ১৯৫২'র প্রথম তিন মাসের মধ্যে বিভিন্ন কোম্পানী, যাদের মোট আদায় কৃত মূলধন ৭৪ লক্ষ টাকা হবে, উঠে গেছে। চা ও কয়লা সংকটের আবর্তে। পাটের উৎপাদন বিক্রয়-সংকটের ফলে নেমে গেছে। ১৯৫২'র প্রথম চার মাসে জুট টেক্সটাইল উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৯১·৮, ৮৩·৭, ৮১·৯ ও ৮১·৭ হাজার টন। লোহা ও ইস্পাতের উৎপাদনও হ্রাস পেয়েছে। পুঁজিবাদী সংকট যে নির্ভুল ভাবে তার মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে সে সম্বন্ধে সচেতনতার কোন লক্ষণ বর্তমান বাজেটে দেখা যাবে না।

ক্রমবর্দ্ধমান আয়-বৈষম্য

পরিশেষে প্রদেশবাসীর আয় কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। প্রধান মন্ত্রী তৃপ্তির সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, "অর্থোপার্জনের বণ্টন ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে এবং আয় যথেষ্ট মাত্রায় ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ জনতার স্তরে ভাল ভাবেই পৌঁছেছে।" এর চেয়ে বড় ধোঁকা আর হতে পারে না। আয়ের বৈষম্য ক্রমশঃই বেশী উৎকট হয়ে উঠছে। এই সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মত না জেনে ওই রকম মন্তব্য করা নিতান্তই অর্থহীন। পরিসংখ্যান-বিজ্ঞান অনুযায়ী Pareto curve ও তার Pareto constant য়ের সাহায্যে সাম্প্রতিক কালের বাঙালীদের আয় বণ্টন অনুসন্ধান করে দেখা গেছে আয়ের অসাম্য ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। এই দিকে অর্থবিভাগের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

কৃষি আয় করের হিসাবও একই কথা প্রমাণ করে। কৃষি আয় কর বিভাগের ১৯৪৯-৫০-য়ের অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, মোট অ্যাসেসের প্রায় শতকরা ৮০ জন নিম্নতম আয়-গ্রুপভুক্ত এবং তারা পেয়েছে মোট উপার্জনের শতকরা মাত্র ২৭ ভাগের কিছু ওপরে; অথচ মোট অ্যাসেসের শতকরা ১·৫%য়ের আয় হ'ল মোট আয়ের ৪০·৫%।

'কল্যাণ-রাষ্ট্রে'র জনতা

কৃষি আয়-করের হিসাব অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের যথার্থ প্রতিচ্ছবি হয় ত' দেয় না, সেকথা ঠিক। এ অবস্থায়, কেন্দ্রীয় সরকারের ফিনান্স মিনিষ্ট্রি প্রচারিত 'ন্যাশনাল ইনকাম ...'র লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেখানে মধ্যবিত্তদের আয়ের অংক উর্দ্ধস্তরের তুলনায় শোচনীয় ভাবে ক্ষীণ বলে স্বীকৃত হয়েছে। এছাড়া ২৫০ টাকা পর্যন্ত উপার্জনকারী সরকারী চাকুরেদের অবস্থার অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে কলকাতা সহরে গড়ে প্রতি মধ্য বত্ত পরিবারের মাসে ঘাটতি পড়ে ৪৬/০ আনা অর্থাৎ সে চাকুরেকে বছরে কর্জ করতে হয় সাড়ে পাঁচশ' টাকার ওপরে। বলা বাহুল্য এ টাকা সরকার দেয় না। আর পঃ বংগের পল্লীজীবনের দিকে তাকালে দেখব শতকরা ৩০·৭টি পরিবারই ঋণগ্রস্ত। আরও এক দিক থেকে দেখলে দেখা যায়, যেখানে ১৯১১ সনে যেখানে ৩৮ লক্ষ কৃষিজীবি ৪৯ লক্ষ লোককে পোষণ করত', সেখানে ১৯৫১ য়ে ৩৭ লক্ষ জনের ভরণ পোষণ করতে হয়েছে ৯৯ লক্ষকে। তারপর শিল্পক্ষেত্রে, ১৯১১য়ে ৮ লক্ষ শ্রমিক ও কর্মচারীর ওপর নির্ভরশীল ছিল ৯ লক্ষ লোক, ১৯৫১য়ে ১৭ লক্ষ জনের পোষণ করতে হয়েছে ২১ লক্ষ লোককে। অর্থাৎ কৃষি, শিল্প বা মধ্যবিত্ত—সর্বক্ষেত্রেই ক্রমশ অল্প উপার্জনকারীর ওপর বেশী সংখ্যক নির্ভরশীল লোক এসে জুটছে, ফলে ঋণের প্রকোপও বেড়ে চলেছে। এই সব কিছু কি আয়ের ক্ষমতা সূচনা করে? এই ভাবেই বোধ হয় ডাঃ রায় মধ্যবিত্তদের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছেন?

এর সংগে শুধু ট্যাক্সের বোঝাটুকু যোগ করলেই ছবি অনেকটা সম্পূর্ণ হয়। ১৯৩৭ সনের তুলনায় মধ্যবিত্তের ওপর ট্যাক্সের বোঝা বেড়েছে আজ ১৭ গুণ। আর গ্রামে রাস্তা, শিক্ষা, চৌকিদারী প্রভৃতি কত কিছুই আরো আছে যা থেকে সহরবাসীরা মুক্ত, যদিও শিক্ষা, রাস্তা, যানবাহন এসবের সুযোগ গ্রামে কমই মেলে।

এত দোষ গলদ বাদ দিলেও, এই এই বাজেট দেউলিয়া বাজেট বলেই স্মরণীয় হ'য়ে থাকবার যোগ্য। ডাঃ রায় যখন শাসনভার গ্রহণ করেন তখন Public debt ছিল ৪ কোটি টাকা; ১৯৫২-৫৩ তে তা বেড়ে হয়েছিল ৫৯ কোটি টাকা; আজ তা বেড়ে হ'য়েছে ৮২ কোটি টাকা। সরকারী ফাণ্ড যা ছিল সব নিঃশেষ করে এখন এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রভৃতিতে হাত পড়ছে। এই ভাবে শাসন চালিয়ে অর্থমন্ত্রী পেছনে যা ফেলে রেখে যাবেন তা এক ভগ্ন জরাজীর্ণ অর্থ নৈতিক কাঠামো।

এই হ'চ্ছে বিধান-রাজত্বের "বিধান"। এই শাসন প্রদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে, এর জনস্বার্থ রক্ষা বা জনসেবার জন্য নয়, কেবল সর্ববিধ শোষণ অত্যাচার নির্যাতন ও করভার-প্রপীড়নের কলংক-কাহিনীর জন্য।

পঃ বঃ যুক্তকিষাণ সভা সম্মেলন

সারা ভারত যুক্ত কিষাণ সভার পশ্চিম বংগ প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক শ্রী সুরেশ চ্যাটার্জী এক বিবৃতি প্রসঙ্গে ঘোষণা করিয়াছেন যে, পশ্চিম বাংলা যুক্ত কিষাণ সভার প্রাদেশিক সম্মেলন আগামী ১৮ই ও ১৯শে এপ্রিল ২৪-পরগণার অন্তর্গত জয়নগর মজিলপুরে অনুষ্ঠিত হইবে। সম্মেলনে শ্রী হেমন্ত বসু, শ্রী সুবোধ ব্যানার্জী ও শ্রী যোগেশ চ্যাটার্জী যথাক্রমে সভাপতি, উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকিবেন। সারা ভারত যুক্ত কিষাণ সভার সম্পাদক শ্রীযদুনন্দন শর্মা ও বিভিন্ন বামপন্থী ও কিষাণ নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছেন।

প্রতিনিধি প্রেরণের শেষ তারিখ ৩১শে মার্চ সাব্যস্ত হইয়াছে। প্রতি এলাকার যুক্ত কিষাণ সভার সাধারণ কৃষাণ সভ্যদের প্রতি ২৫ জনের ১ জন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সভ্যদের চাঁদা, ডেলিগেট ফি (জনপ্রতি দেড়টাকা) ইত্যাদি ১৫ই মার্চের মধ্যে জমা দিতে হইবে।

জেলার ভিত্তিতে স্থানীয় সমস্যা, মহাজনী নির্যাতন, কিষাণদের জীবিকায় ধনতন্ত্রের অনুপ্রবেশের মাত্রা, লেভী প্রথার প্রতিক্রিয়া ফসলের উৎপাদন, চাউলের দাম, বাঁধ, সেচ. ঘেরী সমস্যার (২৬শে ফেব্রুয়ারী প্রাদেশিক কমিটির নির্দেশ নামা অনুযায়ী) তথ্য সহ যে সকল প্রস্তাব কিষাণ কর্মীরা সম্মেলনে উত্থাপন করতে চান, জেলা, গ্রাম, কর্মী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়া ১৫ই মার্চের মধ্যে প্রাদেশিক দপ্তরে পাঠাইতে হইবে।

সম্মেলনের বিস্তারিত সংবাদ অভ্যর্থনা সমিতির কার্য্যালয় হইতে শীঘ্রই ঘোষণা করা হইবে।

(২য় পাতার শেষাংশ)

সভায় যোগদানের জন্য লাল ঝাণ্ডা ও কিষাণ দাবী সম্বলিত পোষ্টার লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া দলে দলে দূরদূরান্তর গ্রাম হইতে কিষাণেরা আসিয়া সমবেত হয়।

সভার প্রধান বক্তা কমরেড নীহার মুখার্জী সিংভূম জিলা কিসাণ সম্মেলনের প্রস্তাবসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া, কিষাণ কর্মীদের দাবীগুলির তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন দুভিক্ষ ও জঙ্গল আইন রোধের আন্দোলনকে তীব্ররূপে গড়িয়া তুলিয়া কিষাণদের বর্তমান দুর্দশা ও লাঞ্ছনার শেষ করিতে হইবে।

সভায় কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্তী, রাধানাথ চাটার্জী, দুঃখীরাম মাডভী, জিং রায় রাজু মণ্ডল, রামাই পাটরা প্রমুখ কিষাণ নেতারা সম্মেলনের দাবীর ভিত্তিতে ও সংগঠনের গুরুত্ব বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করেন।

সভার প্রারম্ভে ও সমাপ্তিতে প্রোগ্রেসিভ কালচার‍্যাল এসোসিয়েসনের চ্যানজোড়া-সরাডোবর সঙ্গীত বাহিনী সাঁওতালী ভাষায় যন্ত্র সহকারে কয়েকটি গণ সঙ্গীত করিয়া সমবেত কিষাণ জনসাধারণকে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেন।

সম্পাদক—শ্রী ...
... প্রেস ... স্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।